পাবলো পিকাসো ও হরিপদ সাঁপুই

হিরণ মিত্র

।।এক ।।

আমরা মস্করা করে বলতাম, পিকাসোর সব হলো, আমার কিছুই হলো না। অবস্থান, খ্যাতি আর মুগ্ধতা প্রসঙ্গে এমন বহু মস্করা উঠে আসে। সত্যিই বিস্ময়কর এই অবস্থান, সাধারণ দর্শক, সমালোচক এই কথোপকথনকে এড়িয়ে বিস্ময় নিয়েই থাকে। আকাদেমিতে ষাটের দশকে একটা বিশাল ট্যাপেস্ট্রি ও ছবির প্রদর্শনী এসেছিল ফরাসী দেশ থেকে। পিকাসো ছিলেন, স্পেনীয় হয়েও ফরাসীদেশে বসবাসের সুবাদে। এমন অনেকেই আছেন। কোটি টাকা মূল্যের পিকাসোর এক ট্যাপেস্ট্রি কোথায় প্রদর্শিত আছে--- তা খুঁজে বের করার আগ্রহই বেশি দেখা যায় দর্শকদের, যদিও অনেক মূল্যবান কাজ অন্যদেরও ছিল। মাতিস, করবুসিয়ে, মিরো, লেজার, ব্রাক, সোনিয়া দিলোনে, রবার্ট দিলোনে --- এমন সব। পিকাসোর একটি প্রায় সাদাকালো মাঝারি মাপের তেলরঙের কাজও ছিল। সেই দেওয়ালটা এখনও মনে পড়ে। বিড়লা আকাদেমিক পিকাসোর ছাপাই ছবির প্রদর্শনী । তাপমাত্রা যন্ত্রের দিকে বারবার তাকিয়ে, দর্শকদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল। খুব বেশি গরমহলেই দর্শকদের সংখ্যা কমিয়ে নির্দিষ্ট মাত্রায় আনার চেষ্টা চলে। এসব স্বভাবতই সংরক্ষণের নিয়মে পড়ে। প্রহরায় তখন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। যে রেখার সূক্ষ্ম জাল বা আঁচড় একাকী ভূমি আকর্ষণ করে থাকে--- ওই সব ছবিতে তার নির্জনতা আমাদের কারও কারও চোখ এড়ায় না।

বিশ্বের যে এত ভাগ আছে --- প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, হরিপদ সাঁপুই -এর সাথে পিকাসোর দেখা হবে একটা ফিক্‌শনের মতো--- সেটা ওই বয়সে বুঝব কেমন করে ? আমার খুব ছোট্ট ছোট্ট শিল্পী বন্ধুরা মানে তাদের বয়স তিন চার পাঁচ--- আমার নাম ধরে ডাকে।বলে তুমিও আঁক, আমিও আঁকি। আমরা বন্ধু। শিল্পের জগৎটা এত সিধে নিয়মে চলে না। এখানে কোন এক পিকাসো বয়স্ক বোদ্ধাদেরসাঁড়াশি দেখিয়ে প্রশ্ন করে--- এটা কী? সবাই যখন বলে ওঠে সাঁড়াশি, তখন ছোট্ট একটি বাচ্চা বলে ওটা কুমীর। এমন সরল নয় এই শিল্পভূমি। এই বোধের জগৎটা আমরা এখনও লালন করতে চাই। বিমুখ হয়ে থাকি তদ্বির, ত্রেতা, নিলামের ঘন্টা থেকে। তখন হয়তো কোন এক সন্ধ্যায় বাইপুরের ডায়মন্ডহারবারগামী লোকাল ট্রেন থেকে, সবজীর ঝুড়ি, ঘুমন্ত মানুষের পিণ্ড, চাদর মুড়ি-দেওয়া কালো কালো ছায়াকে ডিঙিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ে এক সুঠাম, চওড়া কাঁধের, গোল - গলা, ডোরা - কাটা গেঞ্জি গায়ে প্যাবলো ই পিকাসো। নেমেই এদিক ওদিক বিস্ময়ে তাকায়। সামনেই নিরীহ এক ষাঁড় দেখে কী যেমন মনে হয়। চুপচাপ পাতা চিবোচ্ছে। গতিবিধির কড়াকড়ি নেই। যাকে শেষ জীবনে মানুষজন সাংবাদিক সাক্ষাৎকার--- সবকে ছেড়ে স্বেচ্ছা - নির্বাসনে থাকতে হয়েছিল, তার এখানে কী শান্তি! শুধু উজ্জ্বল রঙ নেই। দ্রুত রেখার চলন নেই। গোলাপী নগ্নতা নেই। তবুও।

প্যাবলোর সাথে দশকে দশকে অনেকবার দেখা হয়েছে। কেন যে এমন হলো ঘুরেফিরে একটা লোককে ঘিরেই--- যার প্রভাব নেওয়ার ব্যক্তিত্ব আমরা নিভৃত চয়ন গুনগুনিয়ে চলা, ওই চলনে মেলেও না। তবুও দেখা হয়। দুবার পিকাসো মিউজিয়ামের দরজা থেকে না - ঢুকে ফিরে এসেছি। পৃথিবীর বহু যাদুঘরে ঘুরতে ঘুরতে ওঁর ঘরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছি। নিউইয়র্কের মোমাতে আঁভিগ্‌ননের রমণীদের১ যে নিরাপত্তারক্ষী পাহারা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে--- বিষণ্ণ, দীর্ঘকায় এক নিগ্রো, তার ছবি এঁকেছি। আমাকে সেই বেশি আকৃষ্ট করেছিল তখন, কে জানি না।

এর কিছুকাল আগে আমার প্রথম প্রদর্শনী আকাদেমিতে ছেষট্টি সালে। তাতে সনাতন সেন নামক তখনকার যুগান্তর পত্রিকার কলা - সমালোচক এসেছিলেন। সারা সন্ধ্যে একসঙ্গে কাটান। বারবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন--- আপনার পছন্দের পশ্চিমের কোন এক শিল্পীর নাম বলুন। এমন অদ্ভুত প্রশ্নের মানে অথবা সাংবাদিক সামলানোর অভিজ্ঞতা আমার তখন নেই। তবুও কেমন সন্দেহ হয়। ব্যাপারটাভালো ঠেকে না। প্রসঙ্গ পাল্টাই। এমন করে সন্ধ্যে কাটে। কথা বন্ধ করে আমরা কয়েকজন হাঁটা লাগাই ধর্মতলার দিকে। আলো- ছায়ারাস্তায় কথাও চলতে থাকে। হঠাৎ কথায় কথায় বড় বড় শিল্পীরা ঢুকে পড়েন। আবারও সেই ঘুরিয়ে একই প্রশ্ন --- পছন্দের নাম। নাম ওঠে পিকাসোর। কয়েকদিন পরে অথবা পরের দিন আমার ছবির সমালোচনায় পিকাসো এসে পড়ে। তার প্রভাব নাকি আমার ছবিতে! ভদ্রলোক এমন একটি রসদই খুঁজছিলেন। সেই সময়কার সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় কমলকুমার মজুমদার একটি দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন আমার এই প্রদর্শনী ঘিরে। বহু প্রসঙ্গ এসেছে কিন্তু কোথাও কোন শিল্পীর প্রভাব প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায়নি। তৃতীয় বিশ্ব শিল্পী ও সমালোচক ও দর্শক এই পাশ্চাত্য মাপকাঠি, ইতিহাসকে সাথে নিয়ে শিল্প পরিত্রমায় ব্যস্ত থাকে। ছবি মানেই অমুক। ইতিহাস মানেই ওই সময়কার ইউরোপে কী ঘটেছিল। তার আড়ালে পড়ে থাকে আমাদের অবহেলিত ছবির বা দৃশ্যের পাহাড়। দৃশ্যের পর দৃশ্য ভাবনা এলোমেলো মনে হয় এই বিখ্যাত শিল্পী ও তাকে ঘিরে ইতিহাসের রমরমায়। আসলে এই সবই অর্থনীতির প্রভূত্বের প্রকাশ। এদের প্রতিভা ভ্রাতীত। কিন্তু একে লালন করা, প্রচার ও প্রভাব--- অন্য মহিমায় চিরকাল প্রতিষ্ঠা করেছে, এরই ভগ্নাংশ এ দেশেও প্রতিষ্ঠি।

সল্টলেকের স্বভূনিতে এক রমণী - ক্রেতা একটি ছোট গ্যালারীতে স্থানীয় শিল্পীদের অনেক ছোট - বড় ছবির মধ্যে হঠাৎ খুঁজে বসে পিকাসোকে। তার সখ হয়েছে, বাড়ীতে পিকাসো রাখার। কেমন ভাবে যেন নাম জেনেছে। প্রশ্ন ছোঁড়ে 'ইধার কোই পিকাসো নেহী হ্যায়?' গ্যালারীর লোকজন ভাবেন হয়তো অনুলিপি চাইছেন। তিনি ভুল ভাঙিয়ে সোচ্চারে বলে ওঠেন 'নেহী - নেহী, হাম এক্ অয়েল পেন্টিং চাহ্তি হ্যায়।' আমরা সোচ্চারে বলতাম---- যদি পাহাড়েই উঠতে হয়, এভারেস্টেই উঠব। যদি ঘরে ছবিই টাঙাতে হয়, তবে পিকাসোই টাঙাবো। হায়, পিকাসোর মা - ও এটা বুঝেছিলেন। বলেছিলেন, ও যদি সেনাবাহিনীতে যোগ দিত তবে জেনারেল হতো। ছবি আঁকতে এসে পিকাসো হলো। মানে পিকাসো হয়েছিলেন পিকাসো। এই গাথা গত শতকে মূল্যমান নির্ধারণ করতো। আমরা এসব কোন দিনই বুঝিনি। তাই বারবার হরিপদ সাঁপুইকে টেনে এনেছি। আসল পিকাসো এসব কোনদিন জানতেন না।

শিল্পী পরিতোষ সেন মহাশয় পিকাসোর সাক্ষাতে এসেছিলেন। বারবার বহু জায়গায় একথা তিনি লিখেছেন। তখন সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার বারীন সাহা। উনিই নাকি সব ব্যবস্থা করেন। যদিও বারীনদা আমাদের কাছে কোনদিনও এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেননি। হয়তো কথাটা ওঠেনি। সেই সাক্ষাৎকারে একটা অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ ছিল। সেই তিয়াত্তরে পিকাসো মারা যাবার পর সেন মহাশয় এই বিবরণটি লিখেছিলেন। পরে কখনো এই প্রসঙ্গ আনেননি--- আমার যতটা স্মরণে আছে। প্রথমে উনি ওনার কাজ মানে ছবিগুলি দেখান। তারপর পিকাসো তাঁর কাজ দেখান। বিদায়কালে দরজার বাইরে যে লম্বা করিডোর আছে, সেখানে এসে দুজন দাঁড়ান। এইখানে রাখা ছিল দুটি আয়না। ডিম্বাকৃতি --- একটি কনকেভ, আরেকটি কনভেক্স। অর্থাৎ এই আয়না দুটি সাধারণ আয়না নয়।বিকৃত প্রতিচ্ছায়া ধরে থাকে এগুলি। আর তাতে তার তারতম্য ঘটে। পিকাসো হঠাৎ এক অনুষ্ঠানের মতো নানা ভঙ্গিতে মেতে ওঠেন।মুখভঙ্গি করছেন, তারই বিকৃত প্রতিচ্ছায়া পড়ছে দুটো আয়নায়। দু-রকমের। মুখটা লম্বা হচ্ছে। বেঁটে হচ্ছে। বেঁকে যাচ্ছে। হাঁ করছে।ভেংচি কাটছে। কত দীর্ঘ বর্ণনা ছিল তা আমার মনে নেই। কিন্তু যেমন সাঁপুই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, সেও সেখানে ওই অনুষ্ঠান দেখেছিল। কাঠের পাটাতনের মেঝে, কাঠের হাতওয়ালা অদ্ভুত গন্ধের সিঁড়ি। খয়েরী ও ধূসর রঙের স্যাঁতসেঁতে ফরাসী আতরের পরিবেশ। চাইলে এখনও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করা যায়।

তিয়াত্তরের পরও সাঁপুই -এর সাথে পিকাসোর বহুবার দেখা হয়েছে। সে কথায় পরে আসছি। পিকাসো আঁদ্রে বেঁতকে বলেছিলেন 'তুমি কে হে? কর কী? আমি পিকাসো। যন্ত্র ছাড়া নিখুঁত গোল আঁকতে পারি।' ওনার বাড়িতে একবার চুরি হয়। পুলিশ আসে। উনি চোরের যে ছবিটা আঁকেন সেটা নিয়ে পুলিশ এক ল্যাম্পপোস্টকে গ্রেপ্তার করে। এই সব শত শত বানানো অথবা না - বানানোগল্পে যেটা ধরা পড়ে তা আসলে সবই ওই ল্যাম্পপোস্ট। পিকাসো নামক আমাদের ইচ্ছাপূরণের কল্প - কাহিনী। হয়তো একদিন দেখাযাবে এই নামে কেউ কোনদিন ছিলই না। এখান থেকে আমি অন্য

বিবরণে চলে যাব।

।।দুই ।।

অর্থনৈতিক ভাবে যুঝতে যুঝতে ছবির মধ্যে যে তীব্র টানাপড়েন তৈরি হয়, যে অস্থিরতা--- তার পাশে সামাজিক ও র াজনৈতিক চাপ, অনিশ্চয়তা, সময় ও ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যায় বুঝে উঠতে পারি না।মনে হয় আর্থিক স্বচ্ছলতার ও-পিঠে অনেক ছবি আছে। ছবির সাথে কথোপকথন হয়তো তখনই শু হবে। কিন্তু এ আলাপ সাথেসাথেই চলে, মাঝেমাঝে ছেদ পড়লেও। কে যেন ফিস্‌ফিসিয়ে কানে নানা শব্দ, ভাষা ঢুকিয়ে দেয়। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তারা শব্দ থেকে ছবি বনে যায়। কাউকে বলে উঠতে পারি না। বলে উঠতে পারি না যে য াপনই আসলে ছবি, ছবি বলে আলাদা কিছু নেই। উনিশশো এক সালের আত্মপ্রতিকৃতি, নীল সময়ের ছবি পিকাসোর মুখ মনে হচ্ছে মৃতের মুখোশ পরা! ফ্যাকাসে, বিবর্ণ, ক্ষুধার্ত। সেই সময় বন্ধুদের পাঠানো খাবারে দিন চলতো। স্পেনের ফেলে আসা দিন, প্যারিসের ক্ষুধার্ত দিনগুলোকে বিবর্ণ করে রেখেছিল। এমনভাবে যাপন যখন ছবি হয়, যখন তার পাঠ আমরা নিই, সেই পাঠক অনেকটাই অ্যাকাডেমিক। মরমে তেমন ছবি থাকে না। যৌন রোগের আক্রমণের ভয়ে যখন পিক াসো অস্থির, সেই সময় তাঁর তুলিতে উঠে আসে আভিগ্ননের রমণীদের ছবি। ছয় বাই ছয় মাপের বড় সড় ছবিটিতে পঁ াচজন, যৌনকর্মীকে দেখা যাচ্ছে। দোমড়ানো মোচড়ানো রমণী শরীর। যদিও তণী, তবু বয়স নয় আশঙ্কা তাদের অমন রূপ দিয়েছে। নয় মাস লেগেছিল শেষ করতে। উনিশশো সাত সালে আঁকা প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগে, কিউজিমের আনুষ্ঠা নিক জন্ম। তারপর প্রায় কুড়ি বছর লোকচক্ষের আড়ালে উনিশশো সাঁইত্রিশ পর্যন্ত শিল্পীর স্টুডিও - বন্দী। মাত্র কয়েকজন বন্ধু ও শিল্পী তার দেখা পায়।এই সেই ছবি যেখান থেকে সাধারণভাবে বলা হয় বিংশ শতাব্দীর আধুনিক ছবি মোড় নিল। যে ছবিতে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর ছায়া, অস্তিত্ব, মুখোশের আকারে রমণীদের মুখে উঠে আসে। মুখোশ পরা অথবা মুখোশের মত মুখ। চোখ তুলে সামনে ত্রেতার দিকে নিজেকেমেলে রাখা। অমন চোখ, অমন ভ্রু, কপাল, ঠোঁট শুকনে া, গোলাপী ত্বক, আদিম মুখের আদল বহুদিন শিল্পমহলকে শঙ্কিত রেখেছিল। ভয়ার্ত। প্রা ওঠে --- বাদামী বা কালো রঙ কিন্তু ওই রমনীদের রাঙায়নি। তারা প্রাচ্যের লোক। বার্সিলোনার এক রাস্তার নাম ছিল আভিগ্নন। প্রায় মস্করা করে ওই বেশ্যা - অধ্যুষিত রাস্তার নামে তাকে ডাকা হয়। যা পিকাসোর নিজের নয়। তারপর পিকাসোও পাল্টায়।ছবি দেখা ও বে াঝা এক অন্য মাত্রায় চলে যেতে থাকে--- এমনই কথিত হয়। এরই পাশে দুটো ঘটনার কথা আসে। উনিশশো পঁচাশি স ালে আফ্রিকান শিল্পী রবার্ট কোল্‌স্কট পিকাসোর ওই ছবিকে মস্করা করে আফ্রিকান প্রতিকৃতিতে তৈরি করেন বিপরীত ছবি। প্রায় হুবহু শুধুমাত্র অন্য মন্তব্যে--- পিকাসো যেখানে যৌনরোগের আধার হিসেহে গণ্য করছেন মুখোশ পরিহিত রমণীদের। আর যে মুখোশআফ্রিকান লোক - মুখোশের আাদলে এসেছিল তা নেহাতই কিউবিজম ও স্তর প্রক্ষেপণের যৌথ অবস্থান। এছাড়া তা ওই ভূখণ্ডের প্রতি কোন বিরূপতা থেকে নয়, তবুও প্রতিত্রিয়া ঘটে--- রাজনৈতিক প্রতিত্রিয়া। অ াফ্রিকান শিল্পী তার প্রতিদান দিয়ে সচেষ্ট। এমনকি যেফল - সমারোহ ছিল পিকাসোর ছবির নিচের অংশে--- সেই অংশে এখানে দেখানো হয় কাটা তরমুজ ছুরির ফলার মতো, যা একসময় কালো দাসদের একমাত্র আহার ছিল। দ্বিতীয় ঘটনা সিমা আর্ট গ্যালারীতে ওই ছবি নিয়ে বক্তৃতার একটি আয়োজন হয়। দেওয়ালে প্রক্ষেপ করে দীর্ঘ ব্যাখ্যা চলে কীভাবে ছবির চরিত্ররা কোন আচরণে ব্যস্ত। তার দেহ - ভঙ্গিমা, অবস্থান, দৃষ্টি, আদল, এমনকি রঙের পোঁচড় বলে দিচ্ছে শিল্পীর মনের অন্দর - বার্তা। সবটাই মনগড়া। এই বক্তার নিজস্ব ব্যাখ্যা আমাদের তেমন আকৃষ্ট করেছিল--- মঞ্চের মতো একটা শরীর; যাকে বিশ্লেষণ করছে তাই নিজ শরীরে ধারণ করে আছে। এ ব্যাখ্যার অতীত, ভাস্কর্যের মতো চিত্র - ভাস্কর্য।

অ্যাপলিনিয়র নিয়ে আসেন ব্রাককে পিকাসোর কাছে। ব্রাকের সঙ্গে দেখা হয় উনিশশো সাত সালে, তারও আগে প্যা রিসে আফ্রিকার শিল্প প্রদর্শিত হয়। যার ছায়া, মুখোশের ছায়া পিকাসোর আত্মপ্রতিকৃতিতে ভেসে ওঠে উনিশশো ছয়ে। তারই পিঠে আঁকা গার্টুড স্টেইন। একই ছায়া। যে শীতল দৃষ্টি সরাসরি প্রসারিত ওই রমণী মুখে --- হিমশীতলচাহনি--- এমন ছবি এমন পুষ - হস্তক, সেইএগারো বা বারো শতক থেকে আঁকা কোন ইউরোপীয় রমণী - দেহে কখনেও প্রকাশ প ায়নি। পিকাসোকে বলা হয়--- ইউরোপের মূল শিল্প - আঙ্গিনায় যেভাবে অভিনেতা প্রায় পাতলা ফুঁড়ে মঞ্চে ঢোকে, মঞ্চের মেঝের ঢাকনা তুলে, তেমনি উত্থিত অনুপ্রবেশকারী। স্পেনের ক্ষ প্রান্তর থেকে ছিটকে ঢুকে পড়া এই অনুপ্রবেশকারী

নিজেকে চিরকালই তেমনভাবেই দেখেছেন। কী ছবিতে, কী কথায়, কী অর্থ উপার্জনে। এটাকে অনেকেই স্পেনের বিখ্যাত ষণ্ড- যুদ্ধের মতো দেখেছেন। দেখেছেনপিকাসোকে মাতাদোর হিসেবে। ছবিতে ভাস্কর্যে ছাপাই কাজে, রেখার চলনে, রঙের পোঁচড়ায়, ভাস্কর্যের মোচড়ে এমনই ঝিাস, এমনই আত্রমণ, এমনই ধবংসকে উনি প্রশ্রয় দিয়েছেন যে তাই কোন হরিপদ সঁাপুই তার হদিস পায়নি। এখানে পিকাসো নির্মম। তবুও শেষ পর্যন্ত থাকে দৃষ্টি, থাকে রেখা, থাকে ভিতর থেকে দুমড়ে উঠে আসা ত্রন্দন -- যেখানে জিহ্বা বর্শার ফলকের মতো তীক্ষ্ণ, ধারালো।

এ লেখা পিকাসোর পাঠ নয়। এ লেখা আমাদের অবস্থানের পাঠ। তবু আমরা দেখাবো কিভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই কিউবিজমের পরীক্ষাগারে দুই শিল্পী পিকাসো ও ব্রাক একই উঠোনে চর্চা করতে করতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। পিকাসোর অর্থ, প্রতিপ্রত্তি,খ্যাতি, আত্মমগ্ন ব্রাককে পরিত্যাগ করে। কোন যাদুবলে উনিশশোর শীতল ও ক্ষুধার্ত দিনগুলো এমন ভরে উঠল তা আমরা জানি না। কিন্তু সেই সময়কার আত্মপ্রতিকৃতি যেখানে নীল হয়ে যাওয়া মুখ, ক্ষুধার্ত দম্পতি একাকী কঁাধে হাত রাখে, ফ্রেমের বাইরে কোন আশঙ্কা ও আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে, শীর্ণকায় লম্বা আঙুল প্রসারিত, দৃষ্টিটা দর্শক থেকে ফেরানো, কোথাও কৌণিক--- বাস্তবের ক্ষুধা 'নীল সময়ে' আস্তর ঘিরে রাখে। খুব বেশিদিন লাগেনি এই নীল, গোলাপী আভায় ও সময়ে পাল্টে যেতে। ধনী সংগ্রাহকদের বড় প্রিয় ও নীল সময়ের ছবি। একাকী নির্জন দারিদ্র তাদেরকে কোথাও আশ্বস্ত করে। জোট বাঁধা নেই। তাই ভয় পাওয়াও নেই। গোলাপী সময়ে ঢুকে পড়ে খেলোয়াড়ের দল, সার্কাসের ক্লাউন, বানর--- যে বানর ফিরে আসবে প্রায় পঞ্চাশ বছর পর অন্য কৌতুকে। পিকাসোর নিজের কথায় তার ছবি ছিল জীবনপঞ্জী, আত্মজীবনীর মতো তুলি দিয়ে লিখে যাওয়া চিত্রসম্ভার। যেমন ঘটেছে, কিন্তু ঘটনাকে দূরে সরিয়েরেখে, কিন্তু ঘটনা দূর থেকে দেখে, আর ঘটনার উত্তাপে, শীতলতায়, বুঝে উঠতে চাওয়া বেশ বিরল। ঘন ঘন এই অবস্থান পাল্টানো, অভিজ্ঞতাকে ভিতর ও বাইরে থেকে দেখা --- এই যাতায়াত ব্যক্তির টানাপড়েনে নানা মাত্রা আনে। প্রকাশভঙ্গিতে, রঙের ব্যবহারে, প্রাধান্যে, রূপের অনুধাবনে ও বিকৃতিতে, অতল থেকে উঠে আসা বিকৃতি --- একই সাথে বিস্ময় শিল্পী ও দর্শকের কাছে। রেখা যেন ধারালো অস্ত্রের মতো আস্তরকে ফালা ফালা করে। শিল্পীকে কি করে না? সেও তো ঘাতক। তাই ঘাতক বারবার পিকাসোর ছবিতে ভঙ্গি নিয়েছে, মৃত্যু, হত্যাকারী, বিস্তৃত মৃত্যু উপত্যাকা, অন্ধকার ও আলো - অস্তিত্ব মনে হয় শিল্পী খুব কাছে থেকে দেখেছেন ও দেখাচেছন। এমন চলচিচত্রের মতো বয়ে যাওয়া দীর্ঘ সময়, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ--- অংকন - বদ্ধ হয়ে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে দেয়। শুধুমাত্র আঙ্গিকের পট পরিবর্তন তেমন নয়। বস্তুকে বস্তুর মতো বুঝে ওঠা। বস্তুকে স্পর্শে গন্ধে দৃষ্টিতে আত্মস্থ করতে চাওয়া। নারী- স্তনের পেলবতা ও আবেগকে ধরতে গিয়ে দুহাত ভরে ধরতে চাওয়া। যতই রক্ষণশীল প্রশ্ন উঠুক তবুও দু-টো ঝিযুদ্ধ পাশ কাটিয়ে আত্মমগ্ন থেকে যাওয়া --- এ সব -ই বির্তক তৈরি করে। পিকাসো যেখানে বামপন্থী হিসেবে প্রচারিত ও অনুমোদিত হতে থাকেন, ব্রাক দেখা যায় চরম দক্ষিণপন্থীদলে নাম লেখাচেছন।

পিকাসো ছিলেন চাইল্ড প্রডিজি। এমনভাবেই প্রচার ছিল। এর মধ্যে একটা যাদু - ত্রিয়া আছে, একটা রহস্য আছে। এই রহস্যই বলে দেয় পিকাসো হঠাৎ কেন এত মূল্যবান হয়ে উঠলেন। পিকাসো বলেছিলেন আমি আমার নিভৃতকে ওই নীল সময়, গোলাপী সময়ের ক্যানভাসে দিয়ে রক্ষা করেছি। আড়াল করেছি। আমার যৌবনের সফলতা আমার রক্ষাপ্রাচীর হয়েছে। ওই সময়গুলোই আমার প্রাচীর, তার পিছনে আমি নিরাপদ বোধ করেছি। এই অজানা, এই রহস্য, এই কথা --- আমি খুঁজি না, আমি পেয়ে যাই। য়বির জগৎ শিল্পের থেকেও শিল্পীকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তারই আড়াল নিয়ে নিজের দিনপঞ্জী ছবি - ভাষায় এঁকে গেছেন একজন একাকী, প্রেম- ক্ষুধা, কখনও প্রতিবাদী, মানুষের ভালবাসায় এক বর্ণিল শিল্পী --- যাঁর শত্রু শুধুমাত্র খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা আর স্বীকৃতি। পিকাসো নিজেকে কিন্তু চাইল্ড প্রডিজি মনে করতেন না। লতেন 'একটা শিশুর যে অগোছালো মাখামাখি থাকে তা আমার ছিল না। সাত বছর বয়সে প্রথম প্রথাসম্মত শিল্প রচনা --- সমস্ত সূক্ষ্ম কাকাজসহ--- যা আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়েছিল।'

।। তিন ।।

পিকাসো ও মুখ। পিকাশোর মুখে দুটো কালো হীরক খণ্ডের মতো চোখমুখকে সমস্ত শরীরের মতো চালনা করা--- তার থেকে অন্য বিস্তৃতি, অন্য আবিষ্কার--- রমণী তার মুখ নিয়ে বারবার গভীর হয়েছে। চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত। উপহাস মস্করা,

প্রত্যাখ্যান ও নির্লিপ্ততা--- সমস্তই পিকাসোকে সচল রেখেছে। আঁকায়, নির্মাণে, ছাপ তোলায়, বিরামহীন পথ পাল্টানো, অক্লান্ত খোদাই--- মৃত্যুর সামনে প্রশ্ন তোলে ঘরে কি কোন সাদা ক্যানভাস আছে? বয়ে - যাওয়া জীবন মৃত্যুর পরও বয়। পিকাসো তাই মৃত্যু দেখেননি।

ওঁর তথাকথিত মৃত্যুর সময় প্রিয় আফগান কুকুর দুটি চেঁচিয়ে উঠেছিল। পাশে কেউ ছিল না। কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হওয়া না - হওয়ার অনুভবে। শান্ত নিথর শরীরের এক হাত সাদা চাদর আঁকড়ে এই সেদিনের 'লা মন্দ্' সংবাদপত্রের উপর এলানো। আগের রাত্রের করা বিস্তর ছবি মেঝেময় ছড়ানো।

ছোটবেলা থেকে একা একটা মাঠ প্রান্তরে আর ঘরের নিভৃতে দৃশ্য আবিষ্কারে তাই এই পিকাসো মনন এত দূরে এত অজানা জগতে যে তৃতীয় বিশ্ব তা আমাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। পিকাসোর অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি--- কোন কিছুই আমায় ছোঁয় না। সাহস বাড়ে, ছোঁয় শুধু একান্ত নিভৃত জীবন। এ জীবন একার। একাই বহন করে, পৃথিবী নামক ভূখণ্ডে। ঘুর্ণায়মান চেতনায় একাই বিলীন হয় দীপক, সতীনাথ,কৌতমের সাথে। কোন খোঁজখবর, তত্ত্বতালাশ, আদানপ্রদান অপেক্ষায় থাকে না। কাউকে ফেলা যাবে না। আমাদের বুজে থাকা আত্মমগ্ন চোখে পিকাসো চোখ মেলে থাকেন। পিকাসোর চেয়ে বয়সে সামান্য বড় মতিস যখন তুলির রঙের পোঁচড় নিয়ে প্রায়খ্যাপা--- সমালোচকরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের সাথে তুলনা করে পোষাকী নাম রাখছে 'ফভিজম' তা-ই প্রভাবিত করে ওনাকে। চিরকাল অমনই তুলির চলন, মেটা রঙের পোঁচ, অলক্ষ্যে গড়িয়ে পড়ে তরল রঙ--- যত স্ফীতকায় ততই সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়। যেন এক অনন্ত আবিষ্কার। জাঁ ককতো এবার বলেছিলেন 'পিকাসো কারও স্টুডিওতে আসছে শুনলে সবাই দরজা বন্ধ করতো, নয় তো সাম্প্রতিক কাজকর্ম লুকিয়ে ফেলতো।' ঘটনা হচ্ছে উনি নানা চলনে নানা বাঁককে নিজের ভাবনায় প্রতিফলিত করে নিতেন। হয়তো ওই পরিস্থিতি,আশঙ্কা, চড়াই- উৎরাই একই ছন্দে আবার বহুধা বোধে হীরক খণ্ডের গায়ে আলোর অথবা দৃশ্যের প্রতিফল ফেলতো। এই আবিষ্কার পিকাসোকে নিরন্তর ব্যস্ত রেখেছিল। অন্য শিল্পীর খোঁজ, তাকে সূত্র ধরাতো। সেই সূত্র পরতে পরতে নানা মাত্রায় জীবনকে দেখায়। অসম্ভব কৌতূহল, আগ্রহ ও সজীবতা প্রতিদিনই পিছনের বাগানে নতুন ফুল ফুটছে দেখতে চায়। এর নানা অপব্যাখ্যা হয়েছে। পিকাসোর আফ্রিকা আবিষ্কার সেই মহাদেশে না গিয়েও এতটা গুত্বপূর্ণ হয়। কারণ সামান্য লক্ষণ, সূত্র, আভাষই যথেষ্ট। কাজগুলো দেখতেগিয়ে শুধু দেখি স্তরে স্তরে কথা চালাচলি। পরতে পরতে প্রক্ষেপণ। নানা স্তরে। দুটো সমতল নানা তলের ব্যঞ্জনায়। যেমন ভাস্কর্যে, তেমন ছবিতে। যখন সেই বিখ্যাত দু-চাকা সাইকেলের হাতল হয়ে ওঠে ষাঁড়ের শিঙ আর বসার ত্রিকোণ স্থান হয়ে ওঠে মাথা পরস্পর জোড়ার ফলে--- তখনই উনি বলতে থাকেন 'হ্যাঁ, ভালো, সবই ঠিক আছে। কিন্তু ধরা যাক এই কাজটি আমি ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলাম অথবা ঝর্ণা জলে, কোন একজন সাইকেল নির্মাতা তুলে নিয়ে গেল আর বানিয়ে তুলল সম্পূর্ণ এক দু-চাকা সাইকেল তবেই এটা সম্পূর্ণ হয়।' সেখান থেকেই মেটামর্ফসিসের জন্ম। আশর্চ্য জীবনের প্রবহমানতা সম্বন্ধে ধারণা, জীবনের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া শিল্প। শিল্প কোনটা? ওই ষাঁড়ের মাথা আবিষ্কার না ষাঁড়ের মাথা থেকে দু-চাকা সাইকেল? আমাদের ধন্দ কাটে না।

আজকের উত্তর - আধুনিক অবস্থানে পিকাসো নামক আধুনিক বিগত অস্তিত্ব এটাই নাকি বলে--- আর কোনদিন পিকাসো আসবে না। পিকাসো যদি একটা আস্ত অস্তিত্ব হয়, তার টুকরো টুকরো ছোঁয়া হয়তো অনেককে ছোঁবে। আজকের শিল্প - অস্তিত্ব এক ধারণার অস্তিত্ব। ধারণার মোড়ক সম্পূর্ণ হবার পর তাকে আশ্রয় করে চলা শু। এখানেই প্রশ্ন ওঠে আশ্রয়কে ঘিরে ধারণার মোড়ক ও আশ্রয় সমার্থক হয়ে থাকে। লক্ষ্য স্থির রেখে অথবা ভয়েজ ও পিলগ্রিমেজ দুটো যাত্রা হলেও আলাদা মাত্রায়, ও উদ্দেশ্যে প্রবহমান থাকে। ভয়েজ যেখানে অজানা আশঙ্কা ও আবিষ্কারে মগ্ন, পিলগ্রিমেজ সেখানে মোক্ষলাভে স্থির--- এখানেই পিকাসো ও ব্রাক আলাদা হয়ে যান দুই মেতে।

হরিপদ সাঁপুই যেদিন সাঁকোর তলা দিয়ে ডিঙি নিয়ে চলে যায় --- দেখে রোদের আলো জলে প্রতিফলিত হয়ে চিকচিকিয়ে খেলে খেলে যাচ্ছে, সাঁকোর পাটাতনে, ঘাড় তুলে দেখে নেওয়া ছায়ার তালে আলো পাল্টাচ্ছে, পানা ভেসে যাওয়া ঢেউ, বর্ষার জলের ফোঁটা পুরো ক্যানভাস জুড়ে--- যেন তিতাসের অনন্ত বাসন্তীকে ছেড়ে অনন্তে যাত্রা করছে। পাড়া ছেড়ে, কোল ছেড়ে। অজানায়। বাসন্তী এক - শরীর বৃষ্টি নিয়ে কুলকুল বয়ে যাওয়া বর্ষার জলে দু-পায়ের আঙুল দিয়ে মাটিতে আঁকড়াতে চায়। চোখ বাঁধ মানে না

পিকাসো, হপরিপদ, অনন্ত, বাসন্তী, ফ্রাঁসোয়া জিলোট, আমি--- কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। একটা মক্কা যে এমন কান্ন

া হয়ে কলমের ডগায় আটকে যেতে পারে, তুলির আঁচড় হতে পারে, আশ্চর্য লাগছে! যে ধারণাকে আশ্রয় হিসেবে দেখছিলাম--- তার বিপরীতের ছিল অফুরন্ত আবেগ, শিহরণ, আকৃতি। কিন্তু যে ধারণাকে আশ্রয় করে এই আবেগ ভরে যাবে সেখানেই প্রশ্ন করেন পিকাসো 'আমি কী আঁকবো?' লেজে বা মাতিসের মতো উনি পূর্বী ও ভারতীয় ছবির দিকে তাকাননি। ভারত তখন উপনিবেশ। কালীঘাট পটই তখন ইউরোপে সমাদৃত। ভারত বরাবরই এক রহস্যের দেশ হিসেবে আকর্ষণীয়। সাপ, সাধু, মহারাজা আর তার পাশে আদিবাসী শিল্প ও জীবন। তার মধ্যেই কালীঘাট পট। খুবই সাধারণ, অসম্ভব কম মূল্যের--- কিন্তু বলিষ্ঠ এই রীতি আমাদের ছবির জগতে ঢুকে পড়েছিল--- যদিও পট আঁকার চল তখন বাংলাদেশে ও ভারতের অন্য কোনো খুব প্রাচীন না হলেও জনজীবনে বর্তমান। কালীঘাট পটেররঙ ও রেখার মিতব্যয়ী গুণ, লোকশিল্পে যা প্রায় বিরল--- এতে আশ্চর্য মাত্রা দিয়েছিল। এর পুনর্জন্ম আর তেমন ঘটলো না। এমন কি যামিনী রায় তার সাথে অলংকার ও কাকাজকে প্রাধান্য দিয়ে এর সারল্য ও গাম্ভীর্যকে আঘাত করেছিলেন। পটুয়াদের সাধারণজীবন, সাধারণ প্রকরণ, সাধারণ কাগজ -- চিত্রে অসাধারণ রূপ - মাধুর্য আশ্রয় নিয়েছিল। কালো তুলির দু-মুখো আঁচড় যেন তরতর করে বয়ে যেতো। তড়িৎ এবং প্রায় অমনোযোগী রঙ - এর পোঁচড়া ঠিকঠাক অবস্থান করতো না। সরে - টরে থাকতো। এমন নড়াচড়া আমরা প্রায় আশি বছর পর অ্যান্ডি ওয়াহেরেলের ছবিতে দেখবো। যদিও উৎস এক নয়। পপ আর্ট। ইউরোপীয় যন্ত্র - সমাজের লোকশিল্প বা পপুলার আর্টকে ভিত্তি করে যা গড়ে উঠে। আশ্চর্য দুই-ই লোকশিল্প। একটি নগরকেন্দ্রিক, আরেকটি গ্রামকেন্দ্রিক। অর্থাৎ একটিকৃষি জগতের উৎপাদন, আরেকটি বৃহৎ যন্ত্রের উৎপাদন। কালীঘাটের পটুয়ারা মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে এলেও এবং নগরে প্রতিষ্ঠা পেলেও নগরের সাথে অন্যরকম বন্ধন তৈরি করে। বিষয়ে, আঙ্গিকে, প্রকাশে। 'কী আঁকবো'-র কথায়, কোথা থেকে আঁকবো--- তাই উঠে আসে। পিকাসো যখন ভাস্কর্যে মেতে উঠেছেন তখনই প্রায়ই কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু থেকে রূপ আবিষ্কার করতেন। ফ্রাঁসোয়া জিলোট একবার কথা তোলেন, এমন ভাবে না করে স্বাধীন গড়ে নিলেই তো হয়। পিকাসোর উত্তর ছিল 'না, এর সুন্দর এক যুক্তি আছে। যখন আমি ব্যবহৃত, ভাঙ্গা, নানা বস্তুকে সংস্থাপন করি তারা একটা নতুন মেটাফর তৈরী করে। প্লাস্টিক মেটাফর। দর্শক তার পরিচিত পরিত্যক্ত বস্তুকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার সুযোগ পায়--- যা সে ভুলে গিয়েছিল।' অর্থাৎ বস্তুর রূপে, রূপ আরোপ করা। সাইকেলে ষাঁড় দেখতে পাওয়া। খেলনা মোটর গাড়ির মধ্যে বানরের প্রতিকৃতি পাওয়া, সাঁড়াশির মধ্যে কুমীর --- এমন অজস্র আবিষ্কার ও 'কী আঁকবো' - কে প্রসারিত করে। ভুবন - জোড়া বিস্ময় মুক্তি ও আরোপের অপেক্ষায়। এই পিকাসো বর্তমান। এই পিকাসো বিশ শতকে ছাড়িয়ে গেছেন। আরও কত শতক জানি না বলা হয় উনি জীবনের শেষ আঠাশ বছর আর তেমন এগোননি। নিম্নমুখী অবস্থান। ভাস্কর্য, সেরামিক যদিও--- এই সময়ের করা। পিকাসোর সামনে ছিল চিত্র -এর দীর্ঘ অঙ্কিত ইতিহাস। সেই ইতিহাসের উনি ওনার আবেগে প্রায়নতুন ব্যাখ্যা দেন এই সময়ে। তার আগেও ঘটেছে। প্রকাশভঙ্গী, রূপের নতুন স্থাপনা সবই বৈচিত্রে ভরা। তবুও এখানে লড়াই-এর ময়দানটা অন্য। পরিবেশ স্বচ্ছল। স্বাধীনতাকে অন্যভাবে ভোগ করতে চাওয়া। ক্ষমতা - প্রতিপত্তি অন্য ব্যাখ্যা পাচ্ছে। অষ্টআশি বছর বয়সে, অষ্টষট্টি সালে পিকাসো তাঁর ইরোটিক সিরিজ ধাতবে খোদাই করেন। প্রায় সাড়ে তিনশো ছবি। মনস্তাত্বিকরা বয়স ও মনেরবয়সকে হিসেবে আনেন। কিন্তু যে শিল্পী তার জীবনের বেশির ভাগ সময় ব্যক্তিগত চর্চার মধ্যে যুঝে গিয়েছেন, আপন রমণীদের রূপ নিয়ে খেলেছেন, সত্তরোর্দ্ধ বয়সে জ্যাকলিনের প্রতিকৃতি এঁকে লিখেছেন 'ম্যাডাম জেড' --- ইংরাজী আদ্যক্ষরের শেষ লিপি, বোঝাতে চেয়েছেন আর নয়--- সেই শিল্পীর এমন খেলায়, বিলাসে মেতে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

৫

ব্যক্তি ও সমাজ একটা ধাঁধা।

আমি ছবিকে ব্যক্তিগত কথোপকথনে বিফলতায় দেখতে চেয়েছি। বাইরে থেকে আড়াল করেছি। পিকাসো চূড়ান্ত সফলতা নিয়ে নিভৃতকে আড়াল করেছেন। আমার সংলাপ হাওয়ার আঁচড় কাটে। কেউ দেখে কেউ দেখে না। পিকাসো হাওয়াকে ঝড়ে পরিণতকরেন। মানুষ উদ্বেল হয়। এই আমি দু-হাজার সালে প্যারিসের পম্পু দ্যু সেন্টারে তাঁর ভাস্কর্যের একটা বড়সড় প্রদর্শনীতে অন্য সংলাপে মেতে উঠি। ভাস্কর্যগুলো সময় অনুসারে ঘরের পর ঘরে সাজানো। যে সমতল - স্তরের কথা ছবিতে উঠে এসেছে, পরতে পরতে মিলন, ভাস্কর্য ত্রিমাত্রায় যেমন তার চিত্র রচনা করে যায়। আমার পুরোনো অভ্যাস মতো ঘুরে ঘুরে এঁকে যেতে থাকি। দর্শকও ভাস্কর্য--- সেও যেন ভাস্কর্য ছোট ছোট বাচচারা মেঝেতে শুয়ে বসে খেলায়

পিকাসো আঁকে। সে এক মনোরম উত্তেজনা। বালির ভূমির উপর সার সার এলোমেলো কাকতাড়ুয়ার মতো ব্রোঞ্জে ভাস্কর্য হাত - পা মেলে সমুদ্র দেখছে। ছোটশিশুরা এর সবটা দেখছে, আঁকছে । আমি আবার এর সবটা আঁকছি। একটা বৃত্তের মতো। আঁকতে আঁকতে দর্শক নর - নারী পিকাসো বনে যায়। তাদের হাত পা মুখ দাঁড়ানোর ভঙ্গি--- অদ্ভুত বিকৃতি নিয়ে, সরলতা নিয়ে ভাস্কর্যের মুখোমুখি। আমার কালো রেখাগুলো কাগজের উপর অদ্ভুত সম্পর্ক তৈরি করে চলেছে। পরস্পরে। অনেক ভাস্কর্যকে এমন রেখায় মাত্রা দিই। এমন চলন আমার অনেক দিনের। সেই কবে রোঁদ্যার প্রদর্শনী। ছবির পর ছবি। ছবি দিয়ে যেমন ভাস্কর্য খুঁটিয়ে দেখা। প্রান্ত - রেখা দিয়ে ভাস্কর্যগুলো মূর্তি হয়ে উঠতো। কেন এমন করতে উৎসাহ পেতাম--- জানি না। হয়তো সঞ্চালিত রেখাকে আবিষ্কার করা একটা অভিনেতার ভঙ্গীতে। মুর্তিগুলো অভিনেতা, আমি দর্শক। মঞ্চ ঘিরে উৎসব চলেছে। দীর্ঘ সময়ের। এমন অনুষ্ঠানকে ছবি দিয়ে বুঝতে গিয়ে আমার চলনে এসেছে নানা মাপ; ছবি- অভিজ্ঞতাকে, রেখার চলনকে এইসবকাজের মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করতে করতে একটা বোধে ঘনিষ্ঠ হওয়া। যে ঘনিষ্ঠতা বিমূর্ত আধারে পরিমিত রঙের পুনরাবিষ্কার ঘটায়। বিস্ময় আনে--- সেই মেটামরফসিস্। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই অভিজ্ঞতা এতই প্রখর ও তীক্ষ্ণ--- যাকখনও আমায় ব্যাখ্যায় সাজায়নি। শুধু অনুসরণ করেছে। করতে করতে তৃতীয় সংলাপ জন্ম দিয়েছে। মীরা মুখার্জ্জী সারা রাত এলাচি গ্রামে ঢালাই করছেন। কয়েকদিন রাত কাটাচ্ছি ওখানে--- ঘুরছি, অনেক কাজ দেখছি, ছবি তুলছি। ভোরে ফিরে এসে ছবি আঁকছি। ছবিতে, ফর্মে, রঙে। মীরাদি যেমন জ্বলজ্বল করছেন। সেই স্রোতের মতো বয়ে যাওয়া ভাস্কর্যের গায়ের আচঁড়--- যা মেঝামের সুতোয় গড়ে উঠে। সেই বীণার ধবনি। বিপিন গোস্বামীর শান্তিনিকেতনের বাড়িতে অনেক নতুন ভাস্কর্য দেখলাম। খাটের তলায়, কুলঙ্গিতে, ঘরের কোনায়--- দেখতে দেখতে ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবদের আঁকছি, যেন তারা এক-একজন বিপিনদার ভাস্কর্য আমার খাতায় জুড়ে। একে আমি উপভোগ করি। বহুবার গিয়েছি পিকাসোর প্রদর্শনীতে। ঘন্টার পর ঘন্টা চোখ দিয়ে ছুঁয়েছি ব্রোঞ্জের আস্তরকে। অমসৃণ, আলো, ছায়া-ধরা খেলা। পিকাসোর এই মাধ্যম থেকে মাধ্যমে চলে যাওয়া, নানা কোন থেকে রঙ রেখাকে জুড়ে দেওয়া, দ্বিমাত্রাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ত্রিমাত্রায় নিয়ে যাওয়া, তারপর ডৌলকে স্থাপনা করা--- ভাস্কর্যের পূর্বপাঠ, ধরা, বস্তুর গুণ সবকেই আত্রমণ করে। প্রচলিত গড়ে ওঠা ধারা এখানে নির্বাক। অন্য সংলাপ রচনা হতে থাকলো। আমার কালো রেখাগুলো যখন সেই সংলাপে ফিসফিসিয়ে যায়,আপন নিভৃত ভাবনায় রোমাঞ্চ অনুভব করি। শিল্প - মূল্য নিয়ে চিন্তা নেই। যে দ্বিমাত্রা থেকে এমন রচনা ত্রিমাত্রা হলো--- তাই যেন দ্বিমাত্রায় বুঝে উঠতে চাওয়া। অপরিণত হাতে, রেখায়, সংলাপ রচনায়--- আমি শুধু অংশ হতে চলেছি।

।।ছয় ।।

পিকাসো যখন প্যারিসে আসেন উনিশশো চারে তখন প্যারিস ছবির রাজধানী। ফ্রান্সে শিল্প - বিপ্লব ঘটে গেছে।
বিশ শতকের গোড়ায় ফরাসী দেশে তিন হাজার গাড়ি দেখা যেত। উনিশশো সাতে বেড়ে হয় তিরিশ হাজার। তেরোতে দাঁড়ায় পয়তাল্লিশ হাজার। এই সময়ে রাইট - ভায়েদের আকাশ পরিত্রমার সূচনা। বোঝাই যাচ্ছে উঠতি ধনীদের সময় পাল্টাচ্ছে। উনিশশো ছয়ে পিকাসোর ছবি বিত্রি হতে শু করে। উনিশশো নয়ে পিকাসোর খাবার টেবিলের ধারে এ্যাপ্রন পরিহিতা দাসী দাঁড়ায়। উনিশশো বারোয় দূরবর্তী দেশে এক দেওয়ালে তাঁর আঁকা ছবি ব্যবসায়ীরা মনে করেন ভেঙ্গে প্যারিসে পুনর্নির্মাণ করাটা লাভজনক। উনিশশো তিরিশে সতেরো শতকের এক দুর্গ কেনেন। সম্পদ ও শিল্পের এই সহ অবস্থান--- খ্যাতিকে অন্য মাত্রা দেয়। সাধারণ লোক চিত্র বোঝে না, কিন্তু সম্পদ বোঝে। বিশ্বের বিশাল জনসংখ্যা দরিদ্র। তারা আশায় বাঁচে। তাদের মাঝে ধনী হওয়া, তাও আবার চিত্র - ভাস্কর্য - এর মূল্যমানে --- এক অসম্ভব চিন্তা। পিকাসো একসময় সামান্য কয়েকটা আঁচড়ে যে কোন সম্পদের অধিকারী হয়ে যেতে পারতেন। এই যাদুত্রিয়া আসল যাদুকে ছাড়িয়ে যায়। বুঝ থেকে অবুঝের সংখ্যা বেড়ে চলে। এমন এক শিল্পীর ভাস্কর্য ঘিরে আমার চিত্র পরিত্রমা-- এই শিল্প সমাজে কী মাত্রা আনবে জানি না। তাই এতকাল অপ্রকাশ্যে থেকেছে এগুলি। আমাদের ধনী ত্রেতাদের উপদেষ্টা আছে। সেই উপদেষ্টাদের বহু মতামত--- বহু ঘটনা, তদারকি, তদবির, জীবন পঞ্জিকা, গোপন খবরাখবরের উপর নির্ভরশীল! আমার অবস্থান এই বৃত্তের বাইরে। মার্ক টুলির পুত্র নেভিল টুলি বাংলার প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ছবি নিয়ে বহু ব্যবসা ও চর্চা করেছেন। ঘটনাচত্রে এক দ্বিপ্রাহরিক আহারে আমি অন্য প্রতিষ্ঠিতদের সাথে আমন্ত্রিত হই। অন্যরা অবাকই হয়। আমার

অস্বস্তি বাড়ে। তবুও আহার চলাকালীন ও শেষে দীর্ঘ বক্তৃতা এবং কর্ম - পরিকল্পনার কথা শুনতে হয়। যেহেতু তিনি আমাকে চেনেন না অর্থাৎ আমার কাজের সাথে একেবারেই পরিচিত নন, তাই আমার কাজ সম্পর্কে তাঁর কোন আগ্রহ না থাকারই কথা। ব্যাপারটা সেখানেই থেমে যায়। সম্প্রতি নন্দনে আক্‌মল, সেই বিখ্যাত শিল্পী আবিষ্কারক ব্যক্তি, তাঁর আবিষ্কার করেন। আর তাঁর ওই তথ্যচিত্রে ধারাভাষ্য দেন। এরপর আক্‌মল আর কাকে আবিষ্কার করেন। আর তাঁর ওই তথ্যচিত্রে ধারাভাষ্য দেন। এরপর আক্‌মল আর কাকে আবিষ্কার করেন। আর তাঁর ওই তথ্যচিত্রে ধারাভাষ্য দেন। এরপর আক্‌মল আর কাকে আবিষ্কার করেছেন--- জানা যায় না। আমি সেই সন্ধ্যায় এক ফাঁকে আক্‌মলের পকেটে আমার ঠিকানাপত্র গুঁজে দিই। আশা রাখি উনি বাড়তি কাগজের সাথে ওয়েস্টবিনে ওটা চালান করবেন। পিকাসোর আক্‌মল ছিলেন একজন জর্মান। নাম--- কান উইলার। যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে প্যারিস ত্যাগ করতে বাধ্য হন--- স্রেফ জর্মন হওয়ার জন্য। পিকাসোযখন কমিউনিস্ট হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছেন, আমেরিকায় তাঁর ছবির বিক্রী কমে যাচ্ছে। মাতিসের ছবির বিক্রি বাড়তে থাকে তখন। কেমনকরে ছবির দাম নির্ধারণ হয়, কারা এই আকাশচুম্বী দামে আগ্রহ দেখান--- তার পরিসংখ্যা আমাদের কাছে অর্থহীন। তবুও হুসেন সাহেবের একশ কোটিতে একশটা ছবি একটা সংখ্যার খেলা। আমি এই শূন্যের খেলায় বড়ই দুর্বল। কটা শূন্য লক্ষ কোটি অযুত বানায়---তাকে ঘিরে একটা মজার ঘটনা আছে আমার জীবনে। আমার এক মাসতুতো দাদা একসময় বছরের বরাদ্দ ছুটিতে নানা সংসারে গিয়েনানা বানানো খবরাখবর দিয়ে পরিবারগুলোয় বিভ্রান্তি আনতো। ওটাই ছিল ওর প্রিয় খেলা। সত্তরের উত্তাল দিনে আমার সম্পদ নিয়েও ও এমনই এক গল্প বানায়। যখন বাস্তবে আমি দীর্ঘকাল অভুক্ত। খবর-কাগজ ও বৈঠকখানার ওজনে - আনা নিউজপ্রিন্ট, কালোকালি সম্বল করে ছবি আঁকি। ছ'টাকার হান্টার-শু ও পনেরো টাকার বারগেইন কাউন্টারে কাপড় কিনে প্যান্ট বানাই। পনেরো পয়সা এক প্যাকেট চারমিনার। আট পয়সা ট্রামের ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর। থাকি প্রায় বস্তীতে। আমার মাকে গিয়ে বলে পেনটা (তখনকার ঝর্ণা - কলম) আপনি কাগজের উপর ঝাড়বেন। অনেক কালির ফোঁটা কাগজের এ-প্রান্তে ও- প্রান্তে চলে যাবে। তখন সামনে একটা পছন্দ মত সংখ্যা বসিয়ে শুনে নেবেন। এতটাই ধনী আমি। অদ্ভুত পরিহাস!

পিকাসোর মৃত্যুর সাথে সাথেই জ্যাকলিন, তাঁর শেষতম স্ত্রী, সমস্ত ফটক বন্ধ করার নির্দেশ দেন। সাংবাদিক, শিল্পী, বন্ধুবান্ধবদের ঢোকা নিষেধ হয়। এমনকি শেষ - যাত্রাও সংক্ষেপে সামান্য কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। পিকাসো - সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাতা তিনি তখন।

---

১ আভিগ্‌ননের রমনীরা, ১৯০৭, দ্য মিউজিয়াম অব্‌ মডার্ন আর্ট, নিউইয়র্ক।

২ সাধারণত এই মাপের শিল্পীকে নিয়ে লিখতে, ভাবতে গেলে এক ধরনের হীনমন্যতা প্রকাশ পেয়ে যায়। যে সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য হাতে আসতে, কলাসমালোচকদের বইপত্তর--- সবই স্তুতিভরা, তার মধ্য থেকে জন বার্জারের সাকসেস এ্যান্ড ফেলিওর অব পিকাসো অন্য মাত্রা যোগ করে। এর প্রভাব নয়। একটি বৈপরীত্য, ভিতরের টানা পড়েনকে সামনে নিয়ে আসার পদ্ধতি --- ভাবনাকে উসকে দেয়। এছাড়া যে বইয়ের সাহায্য নিয়েছি

পিকাসো ইন থ্রি ডি এডওয়ার্ড কুইন

আন্ডারস্টান্ডিং পিকাসো ডমেনিকো পোরজিয়ো ও মার্কো ভ্যালসেচি

এসেনসিয়াল মর্ডার্ন আর্ট রবিন ব্রেক

এসেনসিয়াল পিকাসো লরা পাইন

পিকাসো এ্যান্ড ব্রাক সিম্পোসিয়াম, মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট, নিউইয়র্ক, মোমো কনটেক্সট এ্যান্ড ক্রিটিসিজম জন কিসিক্‌।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com